চার খলিফার

জীবন ও শাসনব্যবস্থা

বই	**চার খলিফার জীবন ও শাসনব্যবস্থা**
লেখক	ড. মুহাম্মদ সাইয়্যিদ আল-ওয়াকিল
অনুবাদ	মাহমুদ আহমাদ, আবদুল্লাহ কামাল ও সাইদুল মোস্তফা
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

চার খলিফার
জীবন ও শাসনব্যবস্থা

ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আল-ওয়াকিল

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

চার খলিফার জীবন ও শাসনব্যবস্থা

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ পাবলিকেশন
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

পরিবেশনায়
দারুত তিবইয়ান
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭২২-৭৩ ০১ ৩১, ০১৩১৫-৬০ ৫১ ৩৩

অনলাইনে অর্ডার করুন
www.wellreachbd.com
Bookriver.com.bd
BookPoint BD
wafilife.com & rokomari.com-এ

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৯০০ US $ 50, UK £ 30

CHAR KHOLIFAR JIBON O SASONBEBOSTHA
Writer : Dr. Muhammad Saeed Al Wakeel

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, UnderGround, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01317-851380, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95707-8-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

খিলাফতে রাশিদা অর্থাৎ বিশ্বমানবতার একটি আলোকদীপ্ত কাফিলা—যারা শেষ নবি মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর ইসলাম-ধর্মের হাল ধরেন। ইসলামের তীব্র জ্যোতির্ময় বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেন। নবিজির আনীত সাচ্চা ওহিপূর্ণ ধর্মে কোনোরূপ বিকৃতি হতে দেননি। ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ—কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধানকে অবিকল অক্ষুণ্ণ রেখে শান্তিপ্রিয় ইসলামি-মানবতাবোধকে একচুলও বিচ্যুত হতে দেননি। যারা বিনয়ে নম্রকণ্ঠ। বিদ্রোহে উচ্চশির। দান-অনুদানে মুক্তহস্ত। চিন্তাদর্শনে স্বচ্ছ ও সম্ভ্রমশীল। গোটা মুসলিম উম্মাহ যাদের মহত্তম কর্ম-অনুপ্রেরণায় দীপিত-উজ্জীবিত।

এমনই ছিলেন ইসলামের মহান চার খলিফা তথা আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান ও আলি ইবনু আবি তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহুম। নিখাদ, নিখুঁত ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পৃথিবীর সেরা মানুষ। তারা যুদ্ধ করেছেন। সন্ধি করেছেন। তরজা করেছেন। রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলামের সর্বোত্তম সুন্দর আদর্শটি বেছে নিয়ে তার পর সেই অনুপাতে পথ চলেছেন। সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে চির আপসহীন এই চার-সাহাবির জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই, যাতে পরবর্তী কালের উম্মাহর জন্য শিক্ষা ও তারবিয়ত নেই। তাদের সকল ঘটনা ও আচরিত জীবন থেকে, চিন্তা ও অনুভাবনা থেকে সবক হাসিল করেই মুসলিম উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পান।

'ইসলাম, সে তো পরশ-মানিক, তাকে কে পেয়েছে খুঁজি

পরশে তাহার সোনা হল যারা, তাদেরেই মোরা বুঝি।'

অথবা আসহাবি কাননুজুম... অর্থাৎ আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রতুল্য। যারই অনুসরণ করা হোক, হিদায়েতপ্রাপ্ত হবে। এমন হিদায়েতপ্রাপ্ত, আলোকময় ও সোনার মানুষদের সর্দার ও নেতৃস্থানীয় চার সাহাবির বিশ্বস্ত ও বিশদ জীবনী নিরপেক্ষভাবে জানতে হলে বাংলা ভাষায় এই বই পাঠের বিকল্প নেই।

প্রিয় পাঠক, সত্যিই বেহেশতি সওগাতের এ এক আশ্চর্য অনুপম অপূর্ব জীবনগাথা বা জীয়নকাঠি!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বইয়ের সিংহভাগ অনুবাদ করেছেন মাহমুদ আহমাদ। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে তিনি আগে থেকেই পাঠকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এবারও আশা করছি তার অনুবাদ পড়ে পাঠক মুগ্ধ হবেন। কিছু অংশ অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ কামাল ও সাইদুল মোস্তফা। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

গ্রন্থটির অনুবাদ আরবির সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক বিষয়গুলো নিরীক্ষণের মাধ্যমে এর যাথার্থ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন মাহদি হাসান ও মাহমুদ আহমাদ। বরাবরের মতোই ভাষাবিন্যাসের মাধ্যমে বইটিকে পরিমার্জিত রূপ দিয়ে সাজিয়েছেন বিশিষ্ট সম্পাদক কুতুব হিলালী। বানান সমন্বয় করেছেন দক্ষচক্ষু খ্যাত প্রিয়ভাই মাকামে মাহমুদ। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

অতএব, বরাবরের মতোই আমি বলব, এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর, তার সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর অসুন্দর যত, তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতা। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৭ মে ২০২২ খ্রি.

সূচনার আগের কথা

ইসলামে ধর্মবোধ বা ধর্মবাদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য সকল কিছুর মতো সমাজব্যবস্থাও তার অন্তর্গত। কিংবা বলা চলে, মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও তার ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা ও আচার-আচরণ এবং এই ব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ কুরআন-হাদিসের মূল সূত্রাবলির সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় সকলের আছে। মূলত আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদকে কেন্দ্র করেই ইসলামের সমস্ত কাঠামো গড়ে উঠেছে—একথা না বললেও চলে। যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর ইসলামের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তার মূলেও আছে তাওহিদ। স্রষ্টার একত্ব আর সৃষ্ট জীবনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এবং তাদের মধ্যে সেই কারণেই কোনো বড়-ছোট'র প্রভেদ থাকতে পারে না। ঠিক একই কারণে ইসলামে পুরোহিত তথা ধর্মযাজকের কোনো স্থান নেই। নিজের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, দিগ্‌দিশা ও আচার-আচরণের জন্যে প্রত্যেকেই সমান ও প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী। ধনদৌলত, মানমর্যাদা এবং পৃথিবীর সকল সম্পদই মহান খোদা তাআলার। কাজেই প্রত্যেকের ভাগের পরিমাণও তাঁর ইচ্ছায় সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত। মানুষের আত্মা ও দেহের উপর তাঁর সমান কর্তৃত্ব আছে বলেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় ও অ-ধর্মীয় (ইংরেজিতে যাকে Religious ও Secular বলা হয়) কোনো সীমারেখা টানা নেই। ইসলামি আইন তাই মানুষের সামগ্রিক জীবনে বাস্তবায়নযোগ্য একটি কল্যাণকর আইন ও বিধিমালা।

এই মৌলিক নীতি অনুযায়ী মানুষের ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বিধিবিধান রচিত হলো তার নামই শরিয়ত। এই বিধানগুলোর স্বরূপ বুঝতে হলে ইতিহাসের সাহায্য না নিলে চলে না। অর্থাৎ আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও সব রকমের যে রূপদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে, তা যে

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা রাখা উচিত। [সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, আবু মহাম্মেদ হবীবুল্লাহ, পৃষ্ঠা : ৫৬]

ধর্ম হিসেবে ইসলাম একটি সামগ্রিক এবং সর্বজনীন জীবনবিধান। সব কালের এবং সব কিছুরই বিধিবিধান ইসলাম আমাদের সামনে তুলে ধরে। সময়-পরম্পরায় এই বিধিবিধান আমাদের যুগ পর্যন্ত পৌঁছার পেছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তারা হলেন সাহাবায়ে কিরাম। তাদের আত্মত্যাগ, তাদের নিমগ্নতা, তাদের অধ্যবসায়, সংযম-সাধনা এবং আমানতদারি—আমাদের কাছে বিশুদ্ধ ইসলামকে পৌঁছে দিতে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে আলোচনা করেছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা ছিলেন এমন মানুষ—আল্লাহ যাদের বিষয়ে সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহতে সন্তুষ্ট।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা সর্বোত্তম পুরুষ ছিলেন, তারা খলিফায়ে রাশিদ তথা চারজন সৌভাগ্যবান খলিফা। অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দিক, উমর আল ফারুক, উসমান জুননুরাইন, আলি ইবনু আবি তালিব—রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এই চারজন মানুষ ছিলেন ইতিহাসশ্রেষ্ঠ বরেণ্যপুরুষ। ইসলামের সার্বিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান কখনো অস্বীকার করা যায় না। তারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এবং সময়োপযোগিতার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। সাম্যময় শাসনকার্য কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, তার নজির পুরো পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। তারা ইসলামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আরব থেকে ইউরোপে। মদিনা থেকে আর্মেনিয়ায়। ইসলামের জন্য তাদের অবদান তাই অনবদ্য। ইসলামকে সর্বজনীন এবং সর্বকালীন জীবনবিধান রূপে পরিণত করতে তাদের তিতিক্ষা অপরিসীম। তাই ইসলামকে জানতে হলে আগে তাদেরকে জানতে হবে। বিক্ষিপ্তভাবে নয়, ধারাবাহিকভাবে তাদের জীবনমান ও শাসনপ্রণালি সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে হবে।

কিন্তু সাড়ে চৌদ্দশ বছর পরে এসে তাদের জীবন ও শাসন সম্পর্কে সম্যক জানা যেমন সহজ, আবার তেমনই কঠিন। পৃথিবীর বাতাসে প্রতিনিয়ত ছড়াতে থাকা দূষণের মতো তাদের পূতঃজীবনের গায়েও লেপনের চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন কালিমা—কখনো শিয়া রাফিজিদের পক্ষ থেকে। কখনো খারিজিদের তরফ থেকে। কখনোবা ধর্ম-অবমাননাকারী মুক্তজ্ঞান-চর্চাকারীদের পক্ষ থেকে। কখনোবা প্রাচ্যবিদ্যার নামে। এত এত চেষ্টা-

তদবির, দুরভিসন্ধিমূলক মেহনত-মুজাহাদার পরও ধারাবাহিক ও বিশুদ্ধ মাধ্যম থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, সাহাবায়ে কিরামের প্রচারিত মৌলিক জ্ঞান, খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনযাপন ও শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গরূপ আমরা অবগত হতে পেরেছি। এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় বিশেষত আল্লামা ইমাম তাবারি, ইবনু কাসির, ইবনুল আসির, ইবনু আবদুল হাকাম, আবু হানিফা দিনাওয়ারি, ইবনুল খাল্লিকানের মতো বরেণ্য ঐতিহাসিকদের প্রতি। তেমনিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় অধুনাকালের সত্যসন্ধানী ইতিহাসবিদদের প্রতিও। আল্লাহ তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের ওপর অশেষ প্রতিদান দান করুন।

গ্রন্থ সম্পর্কে

আল জাওলাতুত তারিখিয়া ফিল আসরিখ খুলাফাইর রাশিদি : দিরাসাতুন ওয়াসফিয়াতুন লি-আহদাসি তিলকাল ফাতরা। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সাহিত্য অনুষদের প্রাক্তন ডিন ড. মুহাম্মাদ সাইয়েদ ওয়াকিল রচিত একটি গ্রন্থ। যেখানে সংক্ষেপে খুলাফায়ে রাশিদিনের ব্যক্তিজীবন এবং বিস্তারিতভাবে তাদের শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাদের অনন্য অবদানের কথা। গ্রন্থটি বাজারে বিদ্যমান খুলাফায়ে রাশিদিন সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ থেকে ভিন্ন। গ্রন্থটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এখানে প্রদান করা হলো।

১. সুষম সংক্ষেপণ

খুলাফায়ে রাশিদিনের ত্রিশ বছরের শাসনকাল হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম চর্চার আদর্শ এবং একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। ইসলামের ব্যাপকতা, উদারতা, সর্বজনীনতা বোঝার জন্য এই সময়কে অধ্যয়ন করা অনেক জরুরি। চারজন মনীষীর সম্মিলিত ত্রিশ বছরের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখে ফেলা হলেও পূর্ণভাবে তাদের জীবন ও শাসনকালকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন—এমন দাবি কেউই করতে পারবেন না। কিন্তু অল্পকথায় তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর আলোকপাত করা মোটেই সহজ কাজ নয়। বরেণ্য ইতিহাসবিদ ড. মুহাম্মাদ সাইয়েদ ওয়াকিল এই কাজটি সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে। তিনি খুব অল্পকথায় খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসক-জীবনের সবগুলো দিকের প্রতি বোদ্ধাপাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২. পূর্ণবিবরণ

কলেবরে খুব বেশি বিস্তৃত না হলেও লেখক গ্রন্থটিতে সব বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে মুসলিমদের নৌবাহিনী গঠনের আলোচনা তিনি শুরু করেছেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমুদ্র অভিযানের প্রস্তাবনা পেশ, খলিফা কর্তৃক প্রস্তাব নাকচকরণ, উসমান রাদিয়াল্লাহুর আনহুর কাছে পুনরায় প্রস্তাব পেশকরণ, শর্তসাপেক্ষে তার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া—এই সকল বিষয় পাঠক পেয়ে যাবেন একই অধ্যায়ে। সুতরাং একথা বলাই যায় যে, বিবরণের পূর্ণতার দিক থেকেও গ্রন্থটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

৩. নির্মোহ বিশ্লেষণ

বিরোধপূর্ণ প্রতিটি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে লেখক পুরো বিষয়টির বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। সেখানে বিভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ঘটনাগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছেন। এবং ইতিহাস-পাঠের মূলনীতির আলোকে পুরো বিষয়টির সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন।

৪. মৌলিকত্ব অবলম্বন

উদ্ধৃতি অথবা তথ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে লেখক ইসলামের ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থসমূহের আশ্রয় নিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তিনটি উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উৎস তিনটি হলো, ইমাম তাবারি প্রণীত *তারিখুল উমামি ওয়াল মুলুক* (তারিখুত তাবারি নামে প্রসিদ্ধ), হাফেজ ইবনু কাসির প্রণীত *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবনুল আসির প্রণীত *আল কামিল ফিত তারিখ*। এছাড়াও আঞ্চলিক ইতিহাসের জন্য ইবনু আবদিল হাকাম প্রণীত ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব, ওয়াকিদি প্রণীত ফুতুহুশ শাম, আতাবেকি প্রণীত আন নুজুমুজ জাহিরাহ ফি ফুতুহি মিস ওয়াল কাহিরাহ'র মতো বেশ কিছু উৎস-গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছেন।

মৌলিকত্ব অবলম্বন এবং নির্মোহ বিশ্লেষণের গুণে গ্রন্থটি পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি।

৫. আলোচনার আঙ্গিক

লেখক এক অধ্যায়ের সমাপ্তি এবং পরবর্তী অন্য একটি অধ্যায়ের সূচনার মধ্যে ধারাবাহিকতার এক অনিন্দ্য সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়েছেন। তাই পাঠক যখন একটি অধ্যায় শেষ করে পরবর্তী অধ্যায় পাঠ করতে শুরু করবেন, তখন তার কাছে কোনো কিছু অবোধ্য অথবা সংযোগহীন মনে হবে না।

এখানে মোটাদাগে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হলো। এছাড়াও পাঠককে আকৃষ্ট করার আরও অনেক গুণ বইটিতে বিদ্যমান রয়েছে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি বইটিতে বেশ কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। বইটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য, পাঠকের সামনে হৃদয়গ্রাহীভাবে উপস্থাপনের জন্য, আলোচনার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য আমাকে সংযোজন-সংক্ষেপণের মতো কিছু বিষয়ের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে কঠোরভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে, লেখকের বক্তব্যের তাৎপর্য ও গতিশীলতা যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়ে পড়ে। সংযোজন এবং সংক্ষেপণকে যেন কখনো আরোপিত বলে মনে না হয়।

অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে লাইন-বাই-লাইন অনুবাদ না করে ভাবকে বাংলায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বক্তব্যকে সাবলীল রাখতে। এই চেষ্টায় আমি এবং আমরা কতটা সফল হয়েছি, তার বিচারের ভারটি দেওয়া আছে বোদ্ধা পাঠকের ইজলাসে।

গ্রন্থটিতে আবু বকর, উসমান এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের অংশটি অনুবাদ করেছি আমি। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধ্যায়ে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছেন সাইদুল মোস্তফা এবং আবদুল্লাহ কামাল ভাই।

বইটি নিরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করে এবং বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন প্রিয়ভাই মাহদি হাসান। ভাষা-সম্পাদনা করে গ্রন্থটির পাঠে অনায়াস গতি এনে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় লেখক কুতুব হিলালী। বানান ও প্রুফ সংশোধনের দায়িত্বপালন করেছেন প্রিয়ভাই

মাকামে মাহমুদ। আরও অনেকেই হয়তো বিভিন্নভাবে যুক্ত রয়েছেন বইটির সঙ্গে। তাদের সকলকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই মুহাম্মাদ পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী আমাদের প্রিয়মুখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খানকে। তার উৎসাহ, তাগাদা এবং সহায়তায় আমার পক্ষে বইটির অনুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো।

প্রিয় পাঠক, আমাদের জায়গা থেকে সবটুকু চেষ্টা ও মেহনত করে, ভালো কিছুর জন্য চেষ্টার চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়ে বইটি আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। আপনারা বইটি হাতে নিন। পাঠ করুন। মন্তব্য করুন। পরামর্শ দিন। আমাদের উৎসাহিত করুন। ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার দায়বদ্ধতা থাকবে আমাদের।

ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

—মাহমুদ আহমাদ
২০ মে ২০২২ খ্রি.

লেখকের কথা

ইতিহাস পর্যালোচনায় যথার্থ দৃষ্টিকোণ

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালিন ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমায়িন।

ইসলামের ইতিহাস-পাঠের নির্দিষ্ট রীতি এবং পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করতে হবে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ এবং বিশ্লেষণী মেজাজ নিয়ে। স্রেফ এর ধারাবাহিক ঘটনাবলির ওপর নজর বুলিয়ে যাওয়া অথবা হালকাভাবে একে আবছারূপে পাঠ করে যাওয়া ইসলামের ইতিহাস পাঠের রীতি নয়। কারণ এ হলো মুসলিম উম্মাহর জীবন্ত দর্পণ, যেখানে উম্মাহর বাস্তব চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। সমগ্র বিশ্বের জাতি-উপজাতির মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি চিত্রিত হয়।

যেকোনো পাঠকমাত্রই যে ইসলামের ইতিহাসকে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণী মেজাজ নিয়ে পাঠ করতে পারবেন—বিষয়টি এমনও নয়। বরং এর জন্য দরকার বিচক্ষণ ও সুদক্ষ কুশলী জ্ঞানী এমন কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি, যারা ঘটনাপর্বকে অনুধাবন করতে পারবেন এবং প্রজ্ঞার সঙ্গে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে সঠিক বক্তব্যটি তুলে আনতে পারবেন। ঘটনাগুলোকে সুনিপুণভাবে যাচাই-বাছাই করতে পারবেন। যেসকল কথা বাদ দিতে হবে, সেগুলো অনির্ভরযোগ্য। যে ঘটনাগুলোকে দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, সেগুলোকে তারা প্রতিষ্ঠা দিবেন।

ইসলামের ইতিহাসের যারা সত্যিকার পাঠক হবেন, তাদের শুধু ধারাবাহিক পাঠ এবং এর জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকলেই চলবে না। এর বাইরে আরও কিছু বিষয়ের দিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিষয়গুলো আমি ধারাবাহিকভাবে নিচে তুলে ধরছি।

১. সকলকে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, ইতিহাসের ঘটনাপর্ব যাদের হাত ধরে এগিয়ে গেছে, অন্য সবার মতো তারাও মানুষ। তারা তরজা করতে পারেন। তাদের মাধ্যমে সত্য কিন্তু অমীমাংসিত বিষয়টি বহাল থেকে যেতে পারে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণও এর ব্যতিক্রম নন। এমনতর একটি ভাবনা মনে স্থান দিতে পারলে এমন অনেক ঘটনা আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারব, যেগুলো আমাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত মনে হয়ে থাকে। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাই ধরুন। তিনি ফুজাআহ আস সুলামিকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। অথচ আমরা জানি, ইসলামি শরিয়তে কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই কারণে আমরা যখন শুনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাউকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন, তখন প্রথমবার বিষয়টিকে যেমন পুরোপুরি মিথ্যা বলতে পারি না, তেমনই পুরোপুরি সত্য হিসেবেও মেনে নিতে পারি না।

এইসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো—ঘটনাটির পূর্বাপর নিয়ে পড়াশোনা করা। ঘটনার বাস্তব কার্যকারণ, এর পরিবেশ-পরিস্থিতি ও তৎকালীন আরবিয় সংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। তখন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এই ঘটনাটি আসলেই সত্য। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগুনে পুড়িয়ে ফুজাআহ আস সুলামিকে হত্যা করেন, তখন শুরুতে উল্লিখিত মূলনীতিটির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে আমাদের। ইতিহাসের বিবরণ-দাতাদের মিথ্যা বলা অথবা ইতিহাসকে অসত্য মনে করা যাবে না। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রক্তমাংসের একজন মানুষ। তিনি যেমন সঠিক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তেমনিভাবে তার দ্বারা সঠিক কাজটি অন্যভাবেও সম্পাদিত হতে পারে (যা আপাতদৃষ্টিতে আপনার-আমার কাছে ভুল মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিষয়টি ভুল নয়)। তখন এর ব্যাখ্যায় আমরা বলব, একজন মুজতাহিদ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুদ্ধাশুদ্ধ দুটোই করে ফেলতে পারেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কেউ কোনো প্রমাদপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিলেও তিনি এর জন্য একটি সওয়াব পাবেন। আর যিনি সঠিক সিদ্ধান্ত দিবেন, তিনি পাবেন দুটি সওয়াব।

عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ "إِذَاحَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَاحَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

আমর ইবনু আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যদি কোনো বিচারক যথাযথ চিন্তা-ভাবনার পর সমাধান প্রদান করেন, অতঃপর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। আর তিনি গভীর চিন্তা-গবেষণা করে রায়টি প্রদান করেন, তারপরও তাতে যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তবু তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার।[১] অর্থাৎ একজন মুজতাহিদ সর্বাবস্থায় প্রতিদান পাবেন। আল্লাহ তাকে পুরস্কার দিবেন। কাজেই তার বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অধিকার আমাদের নেই।

সুতরাং এসব ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের মন-মানসিকতা এমন হওয়াই কাম্য।

২. যে কালপর্বে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং যে সময়খণ্ডে বসে আমরা সেইসব বিবরণ পাঠ করছি—এই দুই সময়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনাকারীর মুখ থেকে শুনে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই সময়ে এসে আমরা ইতিহাসের কোনো কোনো বর্ণনা পাঠ করে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করি। গবেষণা-বিশ্লেষণ করি। এভাবেই আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির মান নির্ণয় করে থাকি। কারণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় কিছু দুষ্কৃতিকারী অসত্য বানোয়াট মনগড়া বিবরণ প্রচার করে এসেছে সবসময়ই। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সে সময়ের ঐতিহাসিকগণ সেইসব বিবরণ গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং নিজেদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এবং সেগুলোকেই উম্মতে মুসলিমার মূল ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। অপর দিকে আমরা যদি কোনো বর্ণনার মধ্যে জালিয়াতির আভাস পাই, এর সঙ্গে জালিয়াতিতে অভ্যস্ত কোনো ব্যক্তির সম্পৃক্ততা পাই, আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি। বর্ণনাটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করি। নিরপেক্ষভাবে বর্ণনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চারিত্র্য বিচার করি। এবং সব শেষে বর্ণনার নির্ভুল হওয়া অথবা বানোয়াট হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছি।

৩. ঐতিহাসিকগণ এমন অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর বৈধতা প্রমাণ করার মতো অনেক কারণ ও ক্ষেত্র তাদের সময়ে বিদ্যমান ছিল। একারণে তারা বৈধতা প্রমাণের বিষয়গুলো উল্লেখ না করে শুধু ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ফলে সেসব বিষয়ের নিহিত তাৎপর্যগুলো পাঠকের সামনে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ফলে আজকের সময়ে বসে সে-সব ঘটনা

[১] সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৩৭৯

পাঠকেরা অবিশ্বাস করেন। অসত্য মনে করেন। সেগুলোর যথার্থতা নিয়ে তাদের মনে সন্দেহ জাগে। কাজেই যতক্ষণ না আমরা ঘটনা সংঘটনের সময় সম্পর্কে জানতে না পারব, ততক্ষণ ঘটনার ঐতিহাসিকদের বর্ণনা উল্লেখের আসল কার্যকারণ সম্পর্কে আমরা অবগতি লাভ করতে পারব না।

এই কারণে ইতিহাসের পাঠকদের কর্তব্য হলো, যে সময় ঘটনা ঘটেছে, সেই সময়, সেই সময়ের লোকমানস, তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসহ পারিপার্শ্বিক সকল বিষয়ে ধারণা অর্জন করা। এবং তারপরই ঘটনার চূড়ান্ত সত্যমিথ্যায় আমরা পৌঁছতে পারব। এটি করতে পারলে ইতিহাসের সেই খণ্ডাংশের বিষয়েও আমরা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারব।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস-পরিক্রমায় এমন অনেক ঘটনা আমাদের সামনে চলে আসে, যেগুলোকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়পর্বটিকে ভালোভাবে জানতে হবে। আমাদের সময়ে বসে বা ঘটনা সংঘটনের সময়ের বাইরে অন্য কোনো সময়ে অবস্থান করে সেগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা অর্জন করা সম্ভবপর হবে না। কারণ সে ক্ষেত্রে ঘটনার উপসংহারে পৌঁছতে অতিরিক্ত কোনো যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হবে না। তা না হলে ইতিহাস-পর্যালোচকের দৃষ্টি পরিপূর্ণরূপে ঘটনাকে আয়ত্ত করতে পারবে না এবং ফলাফল হিসেবে তিনি ভুল এবং বাস্তবতার বিপরীত সিদ্ধান্তটিই প্রদান করে বসবেন।

আমরা যদি এই নীতিকে সামনে রেখে ইতিহাস পাঠ না করি, তাহলে এমন অনেক বিষয় আমাদের সামনে চলে আসবে, যা আমাদের মন ও মননকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করবে। আমাদের সামনে মানব-ইতিহাসের অস্বচ্ছ চিত্রটিই উঠে আসবে। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখলে আমরা একটি সিদ্ধান্তমূলক অবস্থানে পৌঁছতে পারব। এবং তা হলো, ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা ও সম্মানের স্থানে বহাল রাখতে পারব। ফলে মানুষের বোধের অগম্য কোনো ঘটনার কারণে তাদেরকে আমরা সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করব না। সর্বোপরি, ঘটনা জানার আগে ঐতিহাসিক যে চরিত্রকে আমরা পবিত্র মার্জিত সম্মানিত এবং বিস্ময়কর মনে করতাম, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়াকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব মনে করব না।

কিন্তু এই নীতিগুলোর প্রয়োগ শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বিচ্যুতির পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন ও মন্দকর্ম ধামাচাপা দেওয়ার আগেই করতে হবে—

বিষয়টি এমনও নয়। এমনটি হলে সেটি হবে ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণে ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতির পরিপন্থি কোনো বিষয়ের চর্চাকরণ। কুরআনুল কারিমের দিকেই লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তাআলা বদর এবং উহুদ উভয় যুদ্ধেই মুসলিমদের সম্বোধন করে আয়াত নাজিল করেছেন। কিন্তু উহুদ যুদ্ধে অবতারিত 'আয়াতের উসলুব' বদর যুদ্ধের আয়াত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেছেন—

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য করো এবং তাঁর রাসুলের (নির্দেশ মান্য করো)। তাছাড়া তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। [সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬]

আর উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি বলেন—

حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ .

এমনকী, যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারও কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারওবা কাম্য ছিল আখিরাত। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১৫২]

বদর যুদ্ধের দিন নাজিলকৃত আয়াতে ছিল নির্দেশনা এবং সতর্কতা। আর উহুদ যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ আয়াতে ছিল কোনো পরিবর্তন ও ভালোমন্দের প্রলেপহীন বাস্তবতার নিখাদ বিবরণ। বদর যুদ্ধের সময় মুসলিদের বিবাদের লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে। আর উহুদ যুদ্ধে এই সতর্কবার্তা অস্বীকার করার কারণে সুস্পষ্ট ভাষায় মুসলিমদের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর কুরআনের এই স্পষ্ট উচ্চারণ আমাদের শেখায় যে, কী করে ইতিহাসের পাঠ ও পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় যে দুটি যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন, সে সম্পর্কে কোনো রাখঢাক ছাড়াই

স্পষ্ট ভাষায় কুরআনুল কারিমে এর বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আর সেই দুটি যুদ্ধ হলো উহুদ এবং বদর। উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গেছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটি কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৫]

আর তিনি হুনাইন যুদ্ধের বিষয়ে বলেন—

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ.

আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। [সুরা তাওবা, আয়াত : ২৫]

দেখুন, আল্লাহ তাআলা কত স্পষ্ট ও পরিষ্কার রাখঢাকহীন ভাষায় উহুদ ও হুনাইনে মুসলিদের বিপর্যয়ের কারণ তুলে ধরেছেন। আর এখানে যুদ্ধক্ষেত্রে বিপর্যয়ের যে-সব কারণ আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, একজন মুসলিমের সেগুলো কখনো ভুলে গেলে চলবে না। এসব বিষয় তাকে মনে রাখতে হবে। এবং এসব বিপর্যয়ের কার্যকারণগুলো পরিহার করে চলতে হবে। তবেই সে সমূহ বিচ্যুতি থেকে উদ্ধার পাবে।

এই দুটি যুদ্ধে বিপর্যয়ের কারণ ছিল মুসলিমদের কৃত খেয়ালি সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে সর্বপ্রথম তাদের খেয়ালিপনার বিবরণ দেন। এরপর তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের

বিচ্যুতিগুলো মার্জনা করেছেন। উহুদ যুদ্ধে অংশ নেওয়া সাহাবিদের বিষয়ে তিনি বলেছেন—

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَ اللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

অতঃপর তোমাদেরকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে, যাতে তোমরা উত্তীর্ণ হও। বস্তুত তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। [সুরা ইমরান, আয়াত : ১৫২]

আর হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন—

ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ .

তারপর আল্লাহ নাজিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতিও এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদের এবং এটি হলো কাফিরদের কর্মফল। [সুরা তাওবা, আয়াত : ২৬]

এই হলো ইতিহাস-পাঠের রীতি। এই হলো ইতিহাস-গবেষণার সঠিক পদ্ধতি।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা আমি জরুরি মনে করছি। ইতিহাসের পাঠ-পর্যালোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কী হবে? এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হবে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, যেখানে বর্তমানের আয়নায় সুদূর অতীতের চিত্রগুলো প্রতিবিম্বিত হবে এবং ভবিষ্যতে চলার পথের রূপরেখা অঙ্কন করা হবে। আর এই কারণে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, ইতিহাসের আলোচনা-পর্যালোচনা ও পাঠপরিক্রমাকে সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে বের করে এনে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিস্তৃত জগতে উপস্থাপন করা। এবং এভাবেই ইতিহাসের ঘটনাপর্বগুলো অনাগত প্রজন্মের জন্য অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

এই গ্রন্থে আমি এভাবেই ইতিহাসের আলোচনা করতে সচেষ্ট থেকেছি। তবে কতটা সফল হতে পেরেছি, তা আল্লাহ মহানই ভালো জানেন।

আল্লাহুল মুস্তাআন।

—ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আল-ওয়াকিল

সূচিপত্র

প্রথম খলিফা
খলিফাতুল মুসলিমিন
আবু বকর সিদ্দিক রাদি.-৩১

নাম ও বংশ পরিচয় ৩৩
জন্ম ও শৈশব ৩৩
শারীরিক গঠন ৩৪
ইসলাম গ্রহণ ৩৪
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু বিবরণ ৩৫
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একিন তথা সুদৃঢ় ঈমান ৩৬
ইবাদতে অগ্রগামীতা ৩৬
হালাল ও পবিত্র উপায়ে জীবনযাপন ৩৮
আল্লাহর ভয় ৪০
খিলাফতের বাইআত গ্রহণ ৪২

ধর্মান্তরের ফিতনা
এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান-৪৯

সে সময়ের ভণ্ডনবিরা ৫২

মদিনা অভিমুখে মুরতাদদের অভিযান-৫৫

উসামা-বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ৫৭
বুজাখা যুদ্ধ ৫৯
একজন নারীর নবুওয়তের দাবি ৬৫
বুত্তাহ যুদ্ধ ৭০
মালিক ইবনু নুওয়াইরার হত্যার ঘটনা ৭৪

তথ্য বিশ্লেষণ ও সত্যপ্রকাশ ৭৬
মালিক ইবনু নুওয়াইরার ঘটনায় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ৮১
আরকাবা (ইয়ামামা) যুদ্ধ ৮৬

নাহার আর রাজ্জাল ও মুসাইলামাতুল কাজ্জাব-৮৯

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইয়ামামা গমন ৯০
খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুজাআহ ৯২
যুদ্ধের সূচনা ৯৪
মুসাইলামার পরিণতি ৯৬
হাদিকার (বাগিচা) যুদ্ধ ৯৭
মুসাইলামার মৃত্যু ৯৮
খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে ১০০
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অসন্তোষ ১০১
যুদ্ধের অর্জন ১০৩
ইয়ারমুক যুদ্ধ ১০৪
সৈন্যবাহিনীর প্রতি রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অনুরোধ ১০৬
মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ১০৭
খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুধাবন ১০৮
খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শামে আগমন ১০৯
একক নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান ১১১
রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিকল্পনা ১১৩
হামলার নির্দেশ ১১৬
মদিনা থেকে আগত চিঠি ১১৬
রোমান সেনা-কর্মকর্তার ইসলাম গ্রহণ ১১৭
যুদ্ধের ময়দানে ইকরিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব ১১৯
খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুদ্ধ-পরিচালনা ১২০
ইয়ারমুক যুদ্ধে নারীদের অবদান ১২২
একটি সন্দেহ নিরসন ১২৩
রোমান বাহিনীর পরাজয় ১২৫
ইয়ারমুক যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ১২৫

পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল-১২৭

রোগের সূচনা ১২৭

রোগের কারণ ১২৭
মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা ১২৮
খালিফা নির্বাচনে বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে আলোচনা ১২৮
খিলাফতের দায়িত্বগ্রহণে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মতকরণ ১৩১
খলিফা হিসেবে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম ঘোষণা ১৩১
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকাল ১৩৩

দ্বিতীয় পর্ব

আমিরুল মুমিনিন

উমর ইবনু খাত্তাব

রাদিয়াল্লাহু আনহু-১৩৫

জাহেলি যুগের আবহাওয়ায় ১৩৭
ইসলামের সুধাপান ১৩৮
অনুপম বৈশিষ্ট্য ১৪১
তিনি অনবদ্য ১৪১
উমরের মতে কুরআনের প্রতিধ্বনি ১৪২
খিলাফতের মহান দায়িত্বে ১৪৪
খিলাফতের দায়িত্বে উমর ইবনুল খাত্তাব ১৪৯
উমরের আঞ্চলিক রাজনীতি ১৫০
আন্তর্জাতিক রাজনীতি ১৫৮

তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু বিজয়-১৬১

সেতুর (জিসির) যুদ্ধ ১৬২
বুয়াইবের যুদ্ধ ১৬৪

কাদিসিয়ার যুদ্ধ-১৭১

পরাজয়ে পর পারসিকদের অবস্থা ১৭৪
বিপদের মুখোমুখি মুসলিমবাহিনী ১৭৫
জিহাদে যোগদানের জন্য খলিফার উৎসাহ প্রদান ১৭৬
সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের প্রতি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপদেশ ১৭৮
পারস্য সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি ১৮২
দাওয়াতের জন্য দূত প্রেরণ ১৮৫
রুস্তমের কাদিসিয়া আগমন ১৮৭

শত্রু শিবিরে গুপ্তচর প্রেরণ ১৯৫
মুসলিম সৈন্য শিবিরের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ১৯৬
দুই বাহিনীর সৈন্য বিন্যাস ১৯৭
চূড়ান্ত লড়াই ১৯৮
আগওয়াছ দিবস ২০১
আমওয়াস দিবস ২০২
লাইলাতুল হারির ২০৪
রুস্তমের পতন ২০৫
পলায়নপর সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ ২০৭
বিজয়ের সুসংবাদ মদিনায় ২০৮
যুদ্ধ শেষে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পদ বণ্টন-নীতি ২১০

মাদায়েন বিজয়-২১৪

বাহুরাশিরের যুদ্ধ ২১৭
দজলার সামনে মুসলিম বাহিনী ২২০
ঘোড়ায় চড়ে উত্তাল দজলা পার ২২২
মাদায়েনবাসীদের আত্মসমর্পণ ২২৬
একটি সংশয় ও তার বিশ্লেষণ ২২৮
মুসলিমদের গনিমত লাভ ২২৯

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ-২৩৬

যুদ্ধের কারণ ২৩৬
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন ২৩৮
যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচন ২৩৯
রণাঙ্গনের পথে ২৪২
যুদ্ধের সূচনা ২৪৭
চূড়ান্ত বিজয় ২৫১
যুদ্ধলব্ধ গনিমত ২৫৪
নাহাওয়ান্দে ছজাইফা ২৫৫

শামে বিজয় অভিযান-২৬০

দামেশক অভিমুখে ২৬২
দামেশক অবরোধ ২৬৪
দামেশক বিজয় ২৬৬

দামেশকে মুসলিমদের অবস্থান ২৭১
হিরাক্লিয়াসের দামেশক ত্যাগ ২৭০
দামেশক থেকে ফিহল ২৭২
চূড়ান্ত মুহূর্ত ২৭৫
তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো; আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ২৭৬

বাইতুল মাকদিস বিজয়-২৭৭

যুদ্ধজয়ে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিকল্পনা ২৮২
কুদস (জেরুজালেম) অবরোধ ২৮৫
শাম দেশে উমর ইবনুল খাত্তাব ২৮৯
সেনাপতিদের সঙ্গে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ ২৯২
বাইতুল মাকদিসে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আগমন ২৯৭

মিশর বিজয়-৩০৪

ফারমা যুদ্ধ ৩০৯
বালবিস যুদ্ধ ৩১২
উম্মে দানিন যুদ্ধ ৩১৪
ব্যাবিলন দুর্গের সামনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩১৬
আইনে শামস যুদ্ধ ৩১৮
ব্যাবিলন অবরোধ ৩২০
সংলাপের সূচনা ৩২২
ব্যাবিলন দুর্গে হামলা ৩২৭
সন্ধিচুক্তি ৩৩২
সন্ধিচুক্তি এবং হিরাক্লিয়াস ৩৩৩
ফাইউম বিজয় ৩৩৭

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়-৩৩৯

নাকয়ুস যুদ্ধ ৩৪২
কিরয়াওন যুদ্ধ ৩৪৪
আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ ৩৪৬
মুকাওকিসের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা ৩৫৪
বিজয় অর্জনে বিলম্ব এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র ৩৫৫
রোমান বাহিনীর পরাজয়ের কারণ ৩৫৮
খলিফার কাছে বিজয়ের সুসংবাদ ৩৫৯

আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমানদের ফিরে আসার চেষ্টা ৩৬১

মদিনায় দুর্ভিক্ষ (আমুর রামাদা)-৩৬৫

তাউনে আমওয়াস ৩৭০
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত ৩৭৭

তৃতীয় পর্ব
আমিরুল মুমিনিন
উসমান ইবনু আফফান
রাদিয়াল্লাহু আনহু-৩৯১

নাম ও বংশ পরিচয় ৩৯৩
উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ৩৯৪

সদাচারী গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ-৩৯৬

দৈহিক গুণাবলি ৩৯৬
চারিত্রিক গুণাবলি ৩৯৭
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩৯৯

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ-৪০২

উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন ৪০২
খলিফা নির্বাচন ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইআত গ্রহণ ৪০৮
খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনে সরাসরি অংশগ্রহণ ৪১৫
অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা ৪১৮
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পররাষ্ট্রনীতি ৪১৯
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিজয় অভিযানসমূহ ৪২৩
আজারবাইজান ও রায় অভিযান ৪২৪
রোমানদের হামলার প্রতিরোধ ৪২৬

আর্মেনিয়া জয়-৪২৯

আর্মেনিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ৪২৯
তৎকালীন আর্মেনিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ৪৩০
আর্মেনিয়া বিজয় ৪৩১

আর্মেনিয়ায় শত্রুবাহিনীর সর্বশেষ হামলা ৪৩৬
আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্রোহ দমন ৪৩৭
নিকিউ যুদ্ধ ৪৩৯

আফ্রিকা অভিযান-৪৪৭

যুদ্ধের পর্দা টানতে আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা ৪৫০

নৌযুদ্ধ-৪৫৭

সাইপ্রাসের ভৌগোলিক অবস্থান ৪৬৪
যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ ৪৬৫
আত্মসমর্পণ ও সন্ধি প্রস্তাব ৪৬৯
সাইপ্রাসবাসীদের প্রদত্ত সন্ধির শর্ত ৪৬৯
মুসলিম বাহিনীর সন্ধি শর্ত ৪৭০
চুক্তিভঙ্গ ৪৭১
জাতুস সাওয়ারি যুদ্ধ (Battle of the Masts) ৪৭৫
মুসলিম নৌবাহিনী প্রধানের পরাজয় ও হত্যা ৪৭৭
মুসলিম নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ৪৭৯
মুসলিম সেনাপতিকে বন্দি করার চেষ্টা ৪৮৪
রোম সম্রাটের পরিণতি ৪৮৭

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা-৪৮৮

এক. মসজিদে নববি সংস্কার ৪৮৮
দুই. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি কূপে পড়ে যাওয়া ৪৯০
তিন. পারস্যের অভ্যন্তরে মুসলিম বাহিনীর অভিযান ৪৯১
চার. পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দের হত্যাকাণ্ড ৪৯৮
পাঁচ. তুর্কি দেশে যুদ্ধাভিযান ৫০৩

ফিতনার উদ্ভব ও খলিফার হত্যাকাণ্ড-৫০৯

খলিফার গৃহ অবরোধ ৫১৬
বশীয়ান সাহাবিদের উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে প্রতিরোধ ৫১৮
বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে পানি-সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পানিপ্রার্থনা ৫২০

খলিফার সহায়ক বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ৫২১
আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের (শাহাদতের) জন্য খলিফা
উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্তুতি গ্রহণ ৫২৩
বর্ষীয়ান সাহাবিদের মদিনা ত্যাগ ৫২৫
খলিফার শাহাদতবরণ ৫২৬

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতবরণ পর্যালোচনামূলক কিছু কথা-৫৩২

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদতবরণের পরে সাহাবায়ে কিরামের উক্তি ৫৪১

চতুর্থ পর্ব

আমিরুল মুমিনিন

আলি ইবনু আবি তালিব

রাদিয়াল্লাহু আনহু-৫৪৩

নাম ও বংশলতিকা ৫৪৫
প্রতিপালন ও বেড়ে ওঠা ৫৪৬
ইসলাম গ্রহণ ৫৪৬

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলি-৫৪৭

শারীরিক বৈশিষ্ট্য ৫৪৭
চারিত্রিক গুণাবলি ৫৪৭
রাফিজিদের বানোয়াট হাদিসের কিছু নমুনা ৫৪৮
পোশাক-পরিচ্ছদ ৫৫১
হিজরত ৫৫২
বিবাহ ৫৫৬
সন্তানসন্ততি ৫৬৩
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ ৫৬৫
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের সময় মুসলিম উম্মাহর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ৫৬৬
খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে হজরত আলির দ্বিধা ও সংকোচ ৫৭০
যারা বাইআত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন ৫৭৭
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রথম খুতবা ৫৭৯
উসমান হত্যার বিচারের দাবি প্রত্যাখ্যান ৫৮১

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিযুক্ত আঞ্চলিক শাসকদের সঙ্গে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর আচরণ ৫৮৫
আল জাজিরা অঞ্চলের শাসকগণ ৫৮৬
ইরাকের শাসকগণ ৫৮৬
শাম অঞ্চলের শাসকগণ ৫৮৬
পারস্যের শাসকগণ ৫৮৭
প্রশাসকদের নিয়োগকৃত অঞ্চলে গমন ৫৯১
আলি ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যকার সম্পর্ক ৫৯৫
শাম অভিমুখে বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ ৬০০
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বসরা গমন ৬০৪
বাহিনী নিয়ে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বসরা গমন ৬১৮
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্ধি প্রস্তাব প্রেরণ ৬২৭
সন্ধির সুখবর ৬৩০

জামাল যুদ্ধ-৬৩৮

জঙ্গে জামাল : কতজন লোক মারা গিয়েছিলেন সেই যুদ্ধে? ৬৪৯
জঙ্গে জামাল সমাপ্তির পরের ঘটনাপর্ব ৬৩৫

যুদ্ধের ময়দানের কিছু ঘটনা-৬৫৯

১. হুকাইম ইবনু জাবালার ঘটনা ৬৫৯
২. উমাইর ইবনু আহলাব আজ জাব্বি ৬৬১
৩. আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৬১

যুদ্ধের ফলাফল-৬৬৫

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা ও পর্যালোচনা-৬৬৯

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ ৬৭৮
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়তের বিশুদ্ধতা ৬৮৬
জামাল যুদ্ধের পরের কথা ৭০০
বিদ্রোহীদের দমন ৭০০

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭০২

সিফফিন যুদ্ধ-৭১১

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণ ৭১৭

পানির জন্য লড়াই ৭২০
দুই বাহিনীর দূত প্রেরণ ৭২৫
কারিদের সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা ৭২৭
যুদ্ধের সূচনা ও প্রথম দিন ৭৩০
মুআবিয়ার পত্র আলির উত্তর ৭৪০
আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতবরণ ৭৪১
লাইলাতুল হারির ও শামের সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্গমন ৭৪৭
কুরআন উত্তোলন ও সালিশের আহ্বান ৭৪৮
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাব ৭৪৯
সালিশ নির্ধারণ ৭৫১
সালিশির চুক্তিপত্র ৭৫৩
বন্দি বিনিময় ৭৫৬
খারিজিদের উদ্ভব ৭৫৭
স্তনের মতো মাংসপেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা ৭৬৩
সালিশদের বৈঠক ৭৬৪
বৈঠকের আলোচনা ৭৬৬
তাহকিম বা সালিশের পরে মুসলিমদের অবস্থা ৭৭০
খিররিত ইবনু রাশেদের ফিতনা ৭৭৪
আলি শাসিত ভূখণ্ডে মুআবিয়ার অভিযান ৭৭৫
আলি ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে স্বাক্ষরিত সন্ধিচুক্তি ৭৭৮
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি ৭৭৯
ঘৃণিত ষড়যন্ত্র ৭৮২
মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৮৩
আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৮৪
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু ৭৮৫
প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদতের বর্ণনা ৭৮৮
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের শেষ কিছু সময় ৭৮৯
ওফাতের সময় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স কত হয়েছিল ৭৯১

— প্রথম খলিফা —
খলিফাতুল মুসলিমিন
আবু বকর
সিদ্দিক রাদি.

আবু বকর সিদ্দিক
রাদিয়াল্লাহু আনহু

নাম ও বংশ পরিচয়

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশীয় নাম—আবদুল্লাহ ইবনু আবি কুহাফা (উসমান) ইবনু আমের ইবনু আমর কুরাশি তাইমি। উর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ মুররার কাছে গিয়ে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে তার বংশধারা যুক্ত হয়ে যায়।

তার উপাধি ছিল আতিক। তার অনুপম সৌন্দর্যের কারণে আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়ার কারণে তাকে আতিক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। মুসআব ইবনুজ জুবাইর বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপাধি সিদ্দিক হওয়ার বিষয়ে উলামায়ে উম্মতের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

জন্ম ও শৈশব

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে (অর্থাৎ হিজরতের ৫০ বছর পূর্বে আসহাবে ফিল তথা হস্তীর ঘটনার তৃতীয় বর্ষে) জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ বয়সে তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিন বছরের (২ বছর ১ মাস ২৮ দিন) কনিষ্ঠ ছিলেন। শৈশব-কৈশোর তিনি মক্কা মুকাররমায় কাটান। ব্যবসার কাজের সময়টুকু ছাড়া তিনি মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন না। তিনি জাহিলি যুগ থেকেই ছিলেন মক্কার একজন সম্মানিত নেতা এবং তাদের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিষয়ে প্রসিদ্ধ আছে যে, জাহিলি যুগেই তিনি মদ্যপান ছেড়ে দিয়েছিলেন। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি জাহিলি যুগে মদ্যপান করতেন? জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। প্রশ্নকর্তা জানতে চাইলেন, আপনি এমন করে কেন বলছেন? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, আমি সবসময় নিজের মানবিকতা রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করি। কারণ, মদ্যপানে মানবিকতা এবং সম্মানবোধ বিলোপ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।[১]

---

[১] *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ৩২

শারীরিক গঠন

ইবনু সাদ বলেন, একদিন কোনো এক ব্যক্তি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শারীরিক গঠন কেমন ছিল আমাকে বলুন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তিনি ছিলেন ফর্সা। শীর্ণ দেহ। মাংসহীন কপোল। তার দেহ কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকত। কোমরে স্বাভাবিকভাবে লুঙ্গি আটকে থাকতে চাইত না। চেহারা ছিল কৃশকায়। চোখ ছিল কোটরাগত। কপাল ছিল উঁচু। আঙুলগুলো ছিল মাংসশূন্য।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চুল ছিল সাদা। তিনি কিতমি মেহেদি দিয়ে চুল রাঙাতেন।

ইসলাম গ্রহণ

পুরুষদের মধ্যে প্রথম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। জাহিলি যুগ থেকেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অকৃত্রিম বন্ধু ও সুহৃদ।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের কারণ প্রসঙ্গে ইবনুল আসাকির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, একদিন আমি কাবা প্রাঙ্গণে বসেছিলাম। তখন সেখানে জায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইলও বসেছিলেন। উমাইয়া ইবনু আবুস সালাত তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, হে কল্যাণের অন্বেষী, কেমন আছো?

জায়েদ ইবনু আমর বললেন, হ্যাঁ, ভালো আছি।

এরপর উমাইয়া ইবনু আবুস সালাত তার কাছে জানতে চাইলেন, আপনি কি তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন?

জায়েদ ইবনু আমর উত্তর দিলেন, এখনো পাইনি।

তখন উমাইয়া ইবনু আবুস সালাত আবৃত্তি করে বললেন, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া পৃথিবীর সকল ধর্ম অনর্থক।

এরপর তিনি বললেন, আমাদের মধ্য থেকে? না আপনাদের মধ্যে থেকে? প্রতীক্ষিত নবি কাদের মধ্য থেকে আসবেন?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইতিপূর্বে আমি এমন কোনো নবির কথা শুনিনি, যার প্রতীক্ষায় আরবের লোকেরা প্রহর গুনছে। তখন আমি ওয়ারাকা ইবনু নওফেলের কাছে গেলাম। তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। অতিরিক্ত চিন্তার কারণে তার মুখের ভেতর থেকে শব্দ বের হতো। আমি তার কাছে গিয়ে কাবা চত্বরে শুনে আসা

ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, ভাতিজা, আমি আসমানি কিতাব ও সে সম্পর্কিত জ্ঞানে পারদর্শী। তবে যে নবির প্রতীক্ষা করা হচ্ছে, আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশে তার আবির্ভাব হবে। আমার বংশবিদ্যার পারদর্শিতা থেকে বলছি, আরবের মধ্যে তোমাদের বংশ সবচেয়ে অভিজাত ও শ্রেষ্ঠ।

আমি বললাম, চাচা, নবিরা কী বলে থাকেন?

তিনি বললেন, তিনি যা বলার বিষয়ে আদিষ্ট হন, তা-ই বলেন। তিনি কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন না। অন্য কাউকে জুলুমের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন না। এবং তিনি অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারেন না।

পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নবুওয়ত পাঠালে আমি তার প্রতি ঈমান আনি এবং তাঁর সত্যায়ন করি।[২]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শ্রেষ্ঠত্বের কিছু বিবরণ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল বিজ্ঞজন এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপর উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছেন আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তারপরের অবস্থান হলো আশারায়ে মুবাশশারার বাকি সদস্যগণ। তারপর ধারাবাহিকভাবে আহলে বদর, আহলে উহুদ, হুদায়বিয়ায় অংশ নেওয়া সাহাবিগণ। এরপর বাকি সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল সা.-এর যুগে সাহাবিগণের পারস্পরিক মর্যাদা নির্ণয় করতাম। আমরা সবচেয়ে মর্যাদা দিতাম আবু বকরকে। তারপর উমর ইবনুল খাত্তাবকে। তারপর উসমান ইবনু আফফানকে।[৩]

তাবারি রাহিমাহুল্লাহ এর সঙ্গে যুক্ত করে বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিষয়ে অবগত হয়ে বলেন, প্রতিটি নবির জন্য আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে দুইজন আর জমিনের অধিবাসীদের মধ্যে দুইজন সহায়ক নির্ধারিত থাকেন। আসমানে আমার সহায়ক হলেন জিবরাইল ও মিকাইল। জমিনের অধিবাসীদের মধ্যে আমার সহায়ক হচ্ছেন আবু বকর ও উমর।

আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিছুক্ষণ পূর্বে জিবরাইল আমার কাছে

[২] *তারিখুল খুলাফা*, সুয়ুতি, পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫
[৩] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ৩৬৫৫

এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে জিবরাইল, আমাকে উমর ইবনুল খাত্তাবের কিছু মর্যাদার কথা শোনান।

জিবরাইল বললেন, নুহ আলাইহিস সালাম যতদিন নিজ কওমের মধ্যে বেঁচেছিলেন, ততদিন যদি তার (উমর ইবনুল খাত্তাবের) মর্যাদার কথা বর্ণনা করি, তবু তার মর্যাদার কথা শেষ হবে না। আর উমর হলেন আবু বকরের একটি কল্যাণকর্মের সমান।

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ একিন তথা সুদৃঢ় ঈমান

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পূর্ণ একিন ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব। তার মতো এত গভীর ধর্মবিশ্বাস আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনো মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি। কারও মধ্যে ঈমান তখনই পূর্ণ ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, যখন একদিকে তার মনমগজ সকল বাতিল চিন্তা ও মতাদর্শ হতে মুক্ত হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মুক্ত থাকে, অপরদিকে পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রকে সকল প্রকার মিথ্যা ও অন্যায়ের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের আলোকে উদ্ভাসিত করার কাজে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমানের এই দাবি ও তাৎপর্য সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ঈমান তার মননে, অন্তরে, চিন্তায় ও চেতনায় এমন গভীরভাবে স্থান দখল করে নিয়েছিল যে, তার কথাবার্তায়, আচার-আচরণ ও কাজকর্মে ঈমানের নুর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। তার চিন্তায় পরিচ্ছন্নতার, চরিত্রে মহত্ত্বের, আচার-আচরণে আভিজাত্যের এবং কথাবার্তায় সরলতার স্ফুরণ ঘটেছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর এমন পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যতটা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়, ততটুকু গোটা উম্মতের আর কারও মধ্যে হয়নি। এ কারণে বকর ইবনু আবদিল্লাহ আল-মুজানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেশি নামাজ পড়ে কিংবা রোজা রেখে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, তা নয়; বরং তার শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রকৃত কারণ হলো, তার অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস।[৪]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহুর ঈমান সম্পর্কে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান ও গোটা পৃথিবীবাসীর ঈমান দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আবু বকরের ঈমানের পাল্লাই ভারী হবে।[৫]

ইবাদতে অগ্রগামিতা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেকোনো ভালো ও মহৎ কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। কেউ তাকে কোনো ভালো কাজে অতিক্রম করে যেতে পারতেন না। তিনি

---

[৪] *ফাজাইলুস সাহাবাহ*, ইমাম আহমাদ, হাদিস নং : ১১০

[৫] *শুআবুল ঈমান*, বাইহাকি, হাদিস নং : ৩৫

বিশ্বাস করতেন, আজকে যা করা সম্ভব, আগামীকাল তা সম্ভব না-ও হতে পারে। আজকে আমল করার সুযোগ রয়েছে কিন্তু হিসাব নেই। কিন্তু আগামীকাল হিসাব হবে; কিন্তু আমাল করার সুযোগ থাকবে না। এ কারণে তিনি সুযোগ পেলেই যেকোনো মহৎ কাজ ও ইবাদতে দ্রুত লেগে যেতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে রোজা রেখেছো?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি।

আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাজায় অংশ গ্রহণ করেছো?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো অভাবীকে খাবার দিয়েছো?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করেছো?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি।

এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ সকল মহৎ কাজ সমন্বিতভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যে একসঙ্গে পাওয়া গেলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬]

সকল ধরনের ইবাদাতের ক্ষেত্রে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অগ্রগামিতার কারণে জান্নাতের সকল দরজা তার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি দরজা থেকে তাকে প্রবেশের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একই জাতীয় দুটি বস্তু খরচ করল, জান্নাতের দরজাগুলো থেকে তাকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, এ দরজাটি উত্তম। সুতরাং যারা নামাজি তাদেরকে সালাতের দরজা দিয়ে, যারা মুজাহিদ তাদেরকে জিহাদের দরজা দিয়ে, যারা রোজাদার তাদেরকে রাইয়ানের দরজা দিয়ে এবং যারা সাদকা দানকারী তাদেরকে সাদকার দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। যাকে এ সকল দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য

---

[৬] *সহীহ মুসলিম*, হাদিস নং : ১৭০৭

আমন্ত্রণ জানানো হবে, (ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এতগুলো দরজা) তো তার প্রয়োজন নেই। (কারণ তার উদ্দেশ্য জান্নাতে প্রবেশ করা। আর তা যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই তো হলো।) অধিকন্তু এমন কেউ কী আছেন, যাকে প্রতিটি দরজা দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আছেন। আমি তো আশা করি, তুমিও তাদের একজন হবে।[৭]

হালাল ও পবিত্র উপায়ে জীবনযাপন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো হারাম খাবার তো খেতেনই না; বরং কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারও তিনি গ্রহণ করতেন না। এমন কিছু (অসাবধানতাবশত) কখনো তার পেটে চলে গেলেও এসব খাবার পাকস্থলীতে রাখতেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা বমি করে ফেলে দিতেন। হজরত আয়েশা ও কাইস ইবনু আবি হাজিম রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক গোলাম তার কাছে প্রায়ই খাবার নিয়ে আসত। তবে গোলামটি যখনই কোনো খাবার নিয়ে আসত, আবু বকর রাদি. জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না। যদি তার পছন্দের কিছু হতো, তা হলে খেতেন। আর তাতে অপছন্দের কিছু থাকলে খেতেন না। নিয়মমতো গোলামটি এক রাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলেন। তিনি খাবার থেকে এক লোকমা খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, আজকের এ খাবারটি তুমি কীভাবে সংগ্রহ করেছো?

সে জবাব দিলো, আমি জাহিলি যুগের এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনার কাজ করেছিলাম। তবে এই কাজ আমি ভালো জানতাম না। আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলাম। আজকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে তার বিনিময় দিয়েছে। এ খাদ্য, যা আপনি খেয়েছেন, ঐ কাজেরই বিনিময়।

এ কথা শুনেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে পেটে যা-কিছু ছিল সবই বের করে দিলেন।[৮]

জায়েদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতে রয়েছে, গোলামের মুখে ঐ কথা শুনেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই গিলে ফেলা খাবার বের হয়ে আসছিল না। তখন তিনি পেট ভরে পানি খেতে লাগলেন। অবশেষে পেটে যা-কিছু ছিল সবই বমি বের করে

---

[৭] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস নং : ১৭৬৪

[৮] *কিতাবুয যুহদ*, ইমাম আহমাদ, হাদিস নং : ৫৭৩

দিলেন এবং বললেন, খাদ্যদ্রব্য বের করতে আমার প্রাণও যদি চলে যেত, তা হলেও আমি অবশ্যই তা বের করে ফেলতাম। কেননা, আমি শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত প্রতিটি দেহের জন্য জাহান্নামই হলো উপযুক্ত স্থান। আমার তো ভয় হয়েছিল যে, এ লোকমা থেকে আমার দেহের কিছু অংশ বেড়ে উঠবে।[৯]

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে, একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যান্যদের সঙ্গে একটি সফরে বের হন। পথিমধ্যে এক জায়গায় তারা অবতরণ করেন। তাদের এক একজন স্থানীয় একজনের বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সাইদ খুদরি ও আরও কয়েকজনকে নিয়ে এক বেদুইনের বাড়িতে ওঠেন। তাদের সঙ্গে অন্য একজন বেদুইনও ছিলেন। মেজবানের স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। এ বেদুইন মেজবানের স্ত্রীর সঙ্গে শর্ত করেন যে, যদি তিনি তাদেরকে বকরির গোশত পরিবেশন করেন, তা হলে তার ঘরে পুত্রসন্তান জন্ম হবে। মহিলা এ শর্তে মেনে নিয়ে বকরি জবাই করেন। অতঃপর ঐ বেদুইন আজেবাজে কিছু ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করেন। বকরির গোশত খাওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন সঙ্গে সঙ্গে পেটের সব গোশত বমি করে ফেলে দেন।[১০]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কত পবিত্র জীবনযাপন করতেন, এ ঘটনাগুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি পানাহারের ক্ষেত্রে শুধু হালাল বস্তুর ওপরই নির্ভর করতেন। তদুপরি কোনো খাবারের ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহের সৃষ্টি হলেও তিনি তা পরিহার করে চলতেন। তার এ স্বভাব তার সুউচ্চ তাকওয়া ও পরহেজগারির উজ্জ্বলতম প্রমাণ বহন করে। দ্বীনের মধ্যে খানাপিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বনের গুরুত্ব অপরিসীম। দুআ কাবুলের সঙ্গে এর নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো মুসাফির দীর্ঘ সফর শেষে মলিন বদনে দুহাত বিস্তার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, ইয়া রাব্ব। অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় পোশাক হারাম, অধিকন্তু সে হারাম দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে। তা হলে কীভাবে তার দুআ কবুল হতে পারে?[১১]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাকস্থলী যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল বস্তু গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনি তার চলাফেরার মধ্যেও ছিল অনাবিল স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। তিনি এমন কোনো পথ দিয়েও চলতেন না, যে পথের পাশে ফাসিক ও দুষ্কৃতিকারীরা

---

[৯] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, আবু নুআইম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫

[১০] *মুসনাদু আহমাদ*, হাদিস নং : ১১৪৮২

[১১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং : ১৬৮৬

বসবাস করত। যাতে তার চরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে কারও মনে সামান্যতম সন্দেহও সৃষ্টি হতে না পারে।

একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি অপরিচিত রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ পথ কেমন? লোকটি জানালো, এ রাস্তার পাশে এমন লোকজন বাস করে, যাদের নিকট দিয়ে গমন করতেও আমি নিজে লজ্জাবোধ করি। এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ পথ দিয়ে চলতে লজ্জা করো, অথচ চলছো। তুমি যাও, আমি যাবো না।[১২]

আল্লাহর ভয়

আল্লাহ তাআলার ভয় মুমিন জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। এই গুণ বান্দাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সর্বাবস্থায় তার অন্তরজুড়ে বিরাজ করে আল্লাহর কুদরত, তাঁর মাহাত্ম্য ও বিশালত্ব। ফলে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও আমাল-আখলাক সবকিছুই সুন্দর, পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সবসময় তাঁকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলতেন। তার জীবনের সকল কাজের পেছনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, পরকালীন মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করা। তার অন্তরে আল্লাহর ভয় এত প্রবল ছিল, যা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে যেকোনো মুসলিমের জন্য উজ্জ্বলতম আদর্শ হতে পারে। চাই সে শাসক হোক কিংবা শাসিত, সেনাপতি হোক কিংবা সৈনিক। মুহাম্মদ ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশি আল্লাহকে নিজের ইলম অনুযায়ী ভয় করতেন—এমন কেউ ছিলেন না।[১৩]

তিনি যদিও খিলাফতের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই বলতেন, কেউ যদি দয়া করে আমাকে এ দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি প্রদান করত, তবে আমি খুবই আনন্দিত হতাম। দায়িত্বপূর্ণ কাজকে তিনি শুধু এজন্যই ভয় করতেন যে, পাছে তার দ্বারা এমন কোনো কাজ সংঘটিত হবে, যা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থি ও জাতির জন্য অকল্যাণকর।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর ভয়ে, বিশেষ করে তিলাওয়াতে কুরআনের সময় বেশি বেশি কাঁদতেন। তিনি নিজেও বলেছেন, তোমরা কাঁদো। যদি কান্না না-ও আসে, তবু কান্নার ভান করো।[১৪]

---

[১২] *কানজুল উম্মাল*, আলি আল-মুত্তাকি, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৭

[১৩] *সিফাতুস সফওয়া*, ইবনুল জাওজি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩

[১৪] *কিতাবুজ জুহদ*, ইমাম আহমাদ, হাদিস নং : ৩৬